টোটেম সঙ্গীত

টোটেম সঙ্গীত

আন্দালীব

টোটেম সঙ্গীত, আন্দালীব;
প্রথম প্রকাশ: একুশে বইমেলা ২০১১;
আবহমান প্রকাশনী লিমিটেড,
বাসা ১৩, রোড ৩, ব্লক বি, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯।
abohomanprokashoni@gmail.com
abohoman.deshoz@yahoo.com,
+৮৮০২ ৮২৭০ ৮৪৫

গ্রন্থস্বত্বঃ লেখক; প্রচ্ছদঃ নির্ঝর নৈঃশব্দ্য।
মুদ্রণ - আদর্শ, ১৭৯/৩ ফকিরের পুল, ঢাকা।
মূল্যঃ ১০০ টাকা

Totem Sangeet (Totem Song: *A Collection of Bengali Poems)* by Andaleeb.
Abohoman Prokashoni Limited,
House 13, Road 3, Block B,
Banasree, Rampura, Dhaka-1219.
+8802 8270 845.
abohomanprokashoni@gmail.com
abohoman.deshoz@yahoo.com.
Price : TK 100.00 : : US $ 4.00

I S B N 978 984 8961 04 9

ধনুকে টঙ্কার তুলে ছুটে গেছে তির
জ্যা-মুক্তির বিবিধ উল্লাসে
বিঁধবে কোথায় জানে না অর্জুন

এই গ্রন্থের কোনো উৎসর্গপত্র নেই

সূচি

মদের দোকানের নিচে ৯ ☼ রাবারপাতায় লেখা এলিজি ১০ ☼ নদীর বক্রতা তুমি স্মিতহাস্য হয়ে ওঠো ১১ ☼ কেউ এসে চলে গেছে ১২ ☼ বাসে লেখা কবিতা ১৩ ☼ জাহাজডুবির পর ১৪ ☼ মায়াডোর ১৫ ☼ একটা রঙিন ফুলের পাশে ১৬ ☼ শিস বাজাচ্ছ অ্যানার্কিস্ট ১৭ ☼ মধ্যযাম থেকে কয়েক ছত্র ১৮ ☼ শনিবারে লিখিত খসড়া ১৯ ☼ পাড়ি ২০ ☼ অন্ধ ড্রিলমেশিনের মুখে ২১ ☼ ধানমন্ডি লেকে সুবাতাস ২২ ☼ চাবি ২৩ ☼ পরিবেশ পরিচিতি ২৪ ☼ তার ঘুমন্ত মুখের দিকে ২৫ ☼ তাঁবুঘর ২৬ ☼ ভায়োলা ২৭ ☼ আমি স্নানঘর থেকে বেরিয়ে এসেছি ২৮ ☼ গসপেল গসপেল ট্রুথ ২৯ ☼ তুমি শিখেছ হর্টিকালচার ৩০ ☼ ঈদের দিন সকালের আলাপচারিতা ৩১ ☼ হিজল সংকেত ৩২ ☼ পিয়ানোয় নখচিহ্ন ৩৩ ☼ বেবিসিটার মহিলার চোখ ৩৪ ☼ টোটেম সঙ্গীত ৩৫ ☼ জলের জ্যামিতি ৩৬ ☼ বাঁকানো গ্রীবার নদী ৩৭ ☼ চিহ্ন ৩৮ ☼ সতেরোই নভেম্বর ৩৯ ☼ এ ফর অ্যাপল ৪০ ☼ যত পশ্চিমে যাই ৪১ ☼ উনচল্লিশ ৪২ ☼ আমি তো ঘুণপোকা জানি না ৪৩ ☼ ভুল রুটের বাস ৪৪ ☼ জলে ৪৫ ☼ টানসূত্র ৪৬ ☼ প্রত্নমার্বেল ৪৭ ☼ সমুদ্র সংকেত ৪৮ ☼ গৈরিক দিনাবলি ৪৯ ☼ ক্রিমসন ৫০ ☼ নক্ষত্রপাঠ ৫১ ☼ ঘুম ভেঙে গেলে ৫২ ☼ অনেক ঘাসের মাঠ ৫৩ ☼ আগ্নেয় ৫৪ ☼ হাওয়াবন্দুকের ঘোড়া ৫৫ ☼ স্থলবিদ্যা ৫৬ ☼ এখানে সিঁড়ির ঢাল ৫৭ ☼ দেয়ালিক ৫৮ ☼ সিঁড়িঘরে ৫৯ ☼ কর্পূর-সন্ধ্যার বয়ান ৬০ ☼ ধারণাহীন সঙ্গীতের মত ৬১ ☼ পূর্বের নথি মোতাবেক ৬২ ☼ পাথরবাগান ৬৩ ☼ নীলকুহকের বাড়ি ৬৪

মদের দোকানের নিচে

মদের দোকানের নিচে সমবেত হতে হতে আমরা ভাবি
মেঘ সঞ্চিত হতে কতটা আর সময় নেয়!
হ্যাংওভার থেকে যখন খুলে আসে দিক্‌ভ্রান্তি,
নৈর্ঋত বালকের দ্বিধা। নাচের স্কুল থেকে
সারবেঁধে বেরিয়ে আসে অসংখ্য প্রমিত যন্ত্রের ময়ূর।
বিদীর্ণ পেখম সবার! মদের দোকানের পাশে
জর্জর একটা বাল্‌বের ফিলামেন্ট জ্বলে, ধীরে।
ফলে মাথাপিছু প্রতিজনের ছায়া তৈরি হয়।
সেইখানে আমরা নিচুস্বরে কথা বলি, হাসি।
সমুদ্রের ঢেউ এসে আমাদের পায়ে লাগে।
দৃষ্টি ও চুম্বন বিনিময় শেষে বায়ুপ্রবাহের মত
আমরা দশ দিকে চলে যাই।

রাবারপাতায় লেখা এলিজি

রাবারপাতায় কারা একপ্রস্থ লিখে রাখে শোক! যারা ছিল একদিন
দুরবর্তী পাহাড় নির্মাতা, তারা অজান্তেই লিখতে চেয়ে এলিজি –
লিখেছিল দুরবীণ, নৈঃসঙ্গ্য, সমূহ ঢালের কিনারা। কৃৎকৌশল
জানা নেই তাদের, তবু সেদিকেই ওড়ে মেঘদল, পাখির পালক,
ভরে ওঠে যাদুবাস্তবের অনিঃশেষ পেয়ালা। অর্বাচীন টিলাপুরুষের
দল জানেনি এইসব সমতলের ম্যাজিক। স্তরীভূত রাবারপাতায় কার
নামে লেখা হয় শোক, কার নামে বেজে ওঠে উনিশটা সকরুণ বেহালা!

নদীর বক্রতা তুমি স্মিতহাস্য হয়ে ওঠো

নদীর বক্রতা তুমি স্মিতহাস্য হয়ে ওঠো, এবার বর্ষায়,
ব্রোঞ্জ-দেবতার ঠোঁটে। তুমি নিগূঢ় সংকেত খোলার
এক রুপোরং চাবি হয়ে ওঠো। গহিন, গহিন!
সুলগ্ন পাহাড় এসে মৌনতার পাঠ শিখিয়ে নেবে তোমায়।
তুমি অগুনতি ঢেউয়ের চুড়োয় নির্জন হীরক হয়ে
জ্বলে ওঠো। জ্বলো নৌকো, কাঠশিল্প, এবার বর্ষায়।
তুমি কম্পমান বিরহনগর এক। আহা স্পর্শের বিদ্যুৎ
কে বোঝে আর এই ঋতু! কে বোঝে বলো তরঙ্গের ভাষা?
উজান এমন! তিরতির যৌন-ঘনঘটা!

মেঘ থেকে ছুড়ে দেয়া বৃষ্টির বকুল – কে বোঝে আর
এমন সম্মোহন, নদীর বক্রতা! নিথর-নিথর শুধু বিদ্যুৎ;
তুমি আঁকো এইঋতু জলমগ্ন শোকের শিরোপা।

কেউ এসে চলে গেছে

কেউ এসে চলে গেছে
ওপরের ঘরে
নির্লিপ্ত চাবিসারাইয়ের লোক
একটা পাখি শুধু অস্পষ্ট
রোদের কার্নিশে বসে আছে

বিবদমান স্কুলবালকের দল
যাদের বচসা সমস্ত
ইকো হয়ে ফিরে গেছে দেয়ালে দেয়ালে
আর সিঁড়িঘরে তখন
কেউ এসে চলে গেছে ... কেউ এসে
খুব সন্তর্পণে

কাঠের দরোজায়
একটা দীর্ঘ ছিটকিনির সংশ্লেষ ভুলে
বিষণ্ন বালকের দল
নতমুখে রাস্তা পেরিয়ে চলে গেছে
এমন অনতিদুর

ডানা ফেলে উড়ে গেছে মোহন
কার্নিশের পাখি

চাবিসারাইয়ের লোকটা
রাস্তা হেঁটে হেঁটে রিনিকিঝিনিকি
ম্যাজিক বাজাচ্ছে
ম্যাজিক বাজাচ্ছে

বাসে লেখা কবিতা

(আপ)

দেখো মানিকগঞ্জের আকাশ কী নীল
দেখো রৌদ্রোজ্জ্বল গাড়ি
কেমন সেতু-পারাপারে রত
তিনজন বোটানির ছাত্রী
বাস থেকে নেমে গেলে
ম্লান হল চতুর্পাশ
মাইলপোস্টগুলো হল বিরহের সারি

(ডাউন)

নৈশ নৈশ পথ
রুবিনা আক্তার
তোমার সিঁথির মত সরল শুয়ে আছে
আরিচার মহাসড়ক
ভ্রমণজনিত ক্লান্তি

নাকফুল
আমি দেখি তারার বিস্তার
বিরহসুন্দর চাঁদের দিকভ্রান্তি

জাহাজডুবির পর

জাহাজডুবির পর আমাদের মনে পড়ে বিকল কম্পাস, সূর্যঘড়ি আর পলিনেশীয় বালকের দিন। যাদের জানা ছিল – এ যাত্রা পৌঁছাঁনো হবে না আর রুটিফলের দেশ, নারকেলবীথি, সোমত্ত নারীদের জঙ্ঘা! এ যাত্রা অজস্র হীরক ফলবে আমাদের বিমর্ষ জাহাজের পাশে। আর স্পর্শ হবে অসম্ভব। এইসব দুরগামী নাবিকের আঙুল থেকে হারিয়ে যাবে স্পর্শদাগ, প্রণয়। খালাসিরা হারাবে সোনালি মাউথঅর্গ্যান, ব্যাঞ্জো। সমুদ্রের অতিকায় মন্থন বলে – জাহাজডুবির কথা মাস্তুল জানে সব থেকে আগে, তারপরে আঁধার, সূর্যের অপস্রিয়মাণ আলো। সহনক্ষমতা বস্তুত এক ঝিনুকেরই খোল, আর ভেসে থাকা মৃত্যুন্মুখ জাহাজের চেয়ে ভাল।

মায়াডোর

এই ধরো বিকল টেলিফোন
সম্পর্কহীন রেলগাড়ি
মৃদুলয়ে চলে যায় এসে
আমাদের শ্বেতবর্ণ দালানের গ্রাম
ধসে পড়ে
তার পাশে আলোকতরঙ্গ
সনাতন চাঁদ
এইসব
এইসব
মায়াডোর মুলত
মহিষের শিং থেকে পুনর্বার
জেগে ওঠা তৃতীয় নগর

একটা রঙিন ফুলের পাশে

তিনি দেখছেন
একটা রঙিন ফুলের পাশে
লেখা আছে এবারের বসন্ত
বিথোভেনের সকল প্রজাপতি
চাপল্য নিয়ে উড়ে গেছে
এক অফুরান হর্ষের দিকে
তিনি দেখছেন
খানিক ঢলায়িত কোন
মালিনীর হাসি
বাগানবিলাস
আহা লাস্যের রীতিনীতি
তিনি জমিয়ে রাখছেন খুব
সবুজ প্রকোষ্ঠে
বুকপকেটের খাঁজে
তিনি তুলে নিচ্ছেন
বসন্তবেলার নুড়ি
এই বিভোর মেট্রোপলিসে
তিনি দেখছেন
লকলকিয়ে বেড়ে ওঠা দালানেরা
নুয়ে আছে ভীষণ
এবার বসন্তে
তিনি দেখছেন রংমশাল হাতে
মানুষেরা ছড়িয়ে পড়ছে
আনাচে-কানাচে
গোলার্ধ না জেনে
তিনি দেখছেন
একটা রঙিন ফুলের পাশে
কী করে চুপচাপ বসে আছে
সংবেদনের
অধীর প্রজাপতি

শিস বাজাচ্ছ অ্যানার্কিস্ট

শিস বাজাচ্ছ অ্যানার্কিস্ট
তুমি ফড়িঙের যৌথতা ভেঙে দিচ্ছ
প্রথাব্যঞ্জন
আমাদের বাতাসবাহিত আলাপনগুলো
এড়িয়ে চলে যাচ্ছ তুমি
এত দূর এই দ্বিধার সন্নিকট
একেকটা সন্ত্রস্ত গোলাপের কাছ থেকে
জেনে নিচ্ছ
আকাশ কতটা পাখিসঙ্কুল এইখানে
কতটা এইখানে প্রথার বিস্তার

তুমি শিস বাজাচ্ছ অ্যানার্কিস্ট
তাতে বিনম্র ভেঙে পড়ছে
'শূন্যের নগর'– দ্বিধাসৌন্দর্যে

তবু নতজানু হয়ে কেউ দাঁড়াচ্ছে না
কেউ দাঁড়াচ্ছে না

মধ্যযাম থেকে কয়েক ছত্র

১২ ঃ ০০
রাত বারোটায় ঘড়ির কাঁটাগুলো স্তিমিত হয়ে আসে।
সঙ্গমের চেয়ে বারান্দায় দাঁড়াবার ইচ্ছেরা তীব্র হয়।

১২ ঃ ৪২
আমার কেবলি মনে পড়ে একশৃঙ্গী হরিণের কথা।
বিরহী বনাঞ্চল, দুতাবাসের রাস্তা – যেখানে এসে আর
পথ খুঁজে পায় না বোকা পর্যটক। হায় মৃগনাভি!
কস্তুরীঘ্রাণে থৈ-থৈ উপচে ওঠে রাত থেকে রাতের শহর।

০১ ঃ ৩৫
ঘুড়িশিকারে গেল যারা তাদের কোনো উচ্চতাভীতি নেই।
দুরবর্তী শহরের খাঁজে তারা গচ্ছিত রেখে আসে বায়ুপ্রবাহ,
সূর্যাস্তের স্মৃতি – এইসব মনে আসে আমার – সন্তর্পণে,
আঁধারবেলায়, রাত দেড়টায়।

০২ ঃ ০৮
মধ্যযাম! তোমাকে লক্ষ করে শহরের অনিদ্রারোগীরা সব
ঘড়ি থেকে খুলে নিয়েছেন ঘুমের কাঁটা। বুকপকেটের খাঁজে
রেখে দিয়েছেন সেবনপ্রতীক্ষ্য ঘুমের বড়ি। অফুরান টক্সিক মদ
রেখেছেন তারা রাতের গহিনে, ম্রিয়মাণ কিছু জোনাকির সহায়তায়।

০২ ঃ ১৫
এ'পর্যায়ে ফশ্ করে এককাঠি সিগারেট ধরানো যায়; সহজেই,
নিথর আমার ঘুমের বারান্দায়।

০২ ঃ ৩৭
অসফল সঙ্গমের শোক বুকে চেপে ঘুমিয়ে পড়েছে যারা
অনিদ্রারোগীর আকুলতা এর চে' বেশি কিছু আর নয়।
ফ্রিজিয়াম! ওহ্ ফ্রিজিয়াম!
মরফিয়াসের চোখের গভীরে দেখি নিস্তরঙ্গা আমার শহরখানি ডুবে যায়।

শনিবারে লিখিত খসড়া

টেলিফোন এল না আর
নৈঃশব্দ্য এল
তারে বেতারে
নমিত দালানের পাশ থেকে অফুরান
পায়রার স্রোত এল
উড়ে উড়ে টেলিফোন
এল না আর
ছাদঘরে ঋতুবদল
আহা পায়রার পায়ে বাঁধা
মনের অসুখ এল

পাড়ি

এমন ডিসেম্বরে রেতঃপাতের শোক জেগে ওঠে আমার।
হাওয়ায় হাওয়ায় সাদা পৃষ্ঠাগুলো উড়ে যায়। অপরূপ
হয়ে উঠবার সমস্ত সম্ভাবনা ডিঙিয়ে বিষণ্নতায় যখন
ডুবে গিয়েছিল আমাদের বিবিধ পানপাত্রের হাতল,
দুর থেকে ভেসে আসছিল বিগত শিকারের দৃশ্যাবলি
আর চারিদিকের তামাম হনন।

আমার হননেচ্ছা ... হায়! তামাদি পড়ে আছে দিকচিহ্নহীন
কোথাকার কোন এক লোহার সিন্দুকে! আমি তো বস্তুত
শিশ্নহীন কামুক, শরবিহীন এক তীরন্দাজের বোধকে
সাথে করে পেরিয়ে গিয়েছি এযাবৎকালের সকল তৃণভূমি।
আমার রেতঃপাতের শোক কাটে নাই তবু।

আমি কি সহজ হারিয়ে ফেলেছি যা ছিল আমার
সমস্ত কৌপীন, মেধার কলম, সবুজ লেখার অফুরান কালি।
আমি প্রকৃতই হারিয়ে ফেলেছি সম্ভোগের তাবৎ কৌশল,
এমনকি ছল করবার যৎসামান্য পন্থা প্রকরণ সবি!

অন্ধ ড্রিল মেশিনের মুখে

স্ফুরিত আফিমের বীজ
লেখা আছে প্রার্থনাগারের দেয়ালে দেয়ালে,
যাজকের পায়ুকাম তৃতীয় কিশোর
অতি সামান্যই ভালবাসে

দ্বিধার্ত ক্রসিংয়ে পড়ে আছে সঘন ট্রাফিকের সারি,
আফিম
আফিম

অন্ধ ড্রিল মেশিনের মুখে ফুটোগুলো যেন সব
ফুল হয়ে ফুটে আছে।

ধানমন্ডি লেকে সুবাতাস

ধানমন্ডি লেকে সুবাতাস
আর ছাতিমের গন্ধখানি
আমাকে চেনালেন যিনি
তিনি আদতে একজন
মাঝবয়েসিনী
তার সাথে আরও হাফমাইল
হেঁটে যাওয়া গেলে
পড়ে নেয়া যেত ঠিক
চোখের বিষাদ
আনত স্তনের পাশে
তার মৌন পদাবলি
তার সাথে দু-এক পঙ্‌ক্তি
আরও কথা বলা গেলে
বেশ ভাললাগা হত
আরও কিছু-ক্ষণ
তার সাথে নিবিষ্টে
বসে থাকা গেলে
কথা হত আর্টকালচার
আর সোমবার
পৃথিবীকে ঠিক
কয় দিনে ঘুরে আসে
এই নিমগ্ন ছাতিমের তলে
আমি যেন আজ
হায় কার কাছে যাব
সমস্ত শরীরী শৈথিল্য ভেঙে
লেকসংলগ্ন পথ
তার সাথে হেঁটে যাব
এই সোমবার
ধানমন্ডি লেকে খুব
সুবাতাস বয়ে গেলে

চাবি

চাবি হারিয়ে ফেলি
বাইরে দাঁড়াই

এই নিভন্ত আলোয় দেখি
দরজায় ফুটে আছে
সব কোঁকড়ানো কাঠের ফুল

কারও অপেক্ষায় থাকি
দেশলাই জ্বালাই

এমন দৃশ্যের গুমোট থেকে
বের হব বলে মনে মনে
সঙ্জোপনে
বনের মোষ তাড়াই

দরজার হাতল দেখি
দেখি গঠনের ধ্যান
আসলে কতটা সুগোল

পকেট হাতড়ে খুঁজে আনি
আমার হারানো চাবির অনস্তিত্ববোধ

ওপরে তাকাই –

আকাশের রঙ খুব কালো নয়
যেখানে এখন

পরিবেশ পরিচিতি

চুম্বন ভেঙে গেলে
পৃথিবীর পিকনিকগুলো ভরে ওঠে
অবিরাম শীতদৃশ্যে, অবিশ্বস্ততায়।

খাবারের বাটি, সালাদ,
ঈস্টের রুটি ...

ছত্রাকপাহাড়ে বসে আমাদের
জানতে ভাললাগে পাস্তুরের বিজ্ঞান,
খাদ্য ও স্পর্শ বিতরণকারী নারীদের
সমূহ প্রস্তুতি।

তার ঘুমন্ত মুখের দিকে

তার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকালে মনে হয়
ঘড়িদেরও একটা নিজস্ব গান আছে।
সময়ের চরকায় লেখা আছে আমাদের
নিবিড় বেদনার বোধ, ঘূর্ণনের কৃৎকৌশল।

তার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকালে মনে হয়
সাইকেল হারানো বিজন বালকেরা শোকাবহ
দাঁড়িয়েছে এসে এক মৌন পাহাড়ের নিচে।
সময়ের পারদে লেখা আছে কত শত
নদীর প্রবাহন!

তার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকালে মনে হয়
আহত ঘড়ির কাঁটায় লেগে আছে রোদ্দুর,
হাওয়ার সান্দ্রতা, টোটেম বৃক্ষরাজির গুণাগুণ।

তাঁবুঘর

মাহুত মাহুত বলে ডেকে ওঠে কে এই অলিখিত বনে –
ক্রমশ হাতির বাগানে! সার্কাসের বিনম্র রঙিন বলগুলো
একটা-দুটো করে অবসাদের তাঁবুঘরগুলো ঘিরে নেয়।

সহজ ঘুমের টানেল ছেড়ে অতিকায় ম্যামথের দল
উড়ে গিয়েছিল এক বিষণ্ন আকাশের দিকে।
অন্ধ মানুষেরা তখন জমিয়ে তুলেছিল যূথমেঘ
আর তর্জনীলিপ্ত ব্রেইল অক্ষর আশ্চর্য হাওয়ায়।

মাহুত মাহুত বলে সত্যিই কে যেন ডেকে ওঠে এইবেলা!
দুরাগত হাওয়ায় খুব সার্কাসবালকের হর্ষরেশধ্বনি
শোনা যায়। মেঘে মেঘে জেগে ওঠে কোথায় এক
লুপ্ত মাহুতের বাড়ি, আকাশ ... আকাশ!

অন্ধ মানুষেরা চিরকাল শিরোপার লোভ ভুলে
সার্কাসবাড়ি যায়।

ভায়োলা

কতটা রোদের দেশ থেকে মিহিন
জেগে ওঠে কুয়াশা! তোমার ম্লান ত্বক, বিমর্ষ ভূ-গোল,
আমার এই বিহন বিহন বেলা।
এইসব নিথর অরণ্যানী মুলত নীল দেয়াল এক,
হায় প্রমিত সুন্দর! যার পাশে বসে তৈরি হয়
বেদনার সাঁকো, দীর্ঘশ্বাস, প্রসুন ছায়ার খেলা।

কুয়াশায় ডুবে গেলে তাবৎ বনানী,
পৃথিবীর সমস্ত জানালায় জেগে থাকে ভুল দৃশ্য,
শীতঋতু ...
আর একটা মেপল কাঠের বেহালা।

আমি স্নানঘর থেকে বেরিয়ে এসেছি

সম্পর্কের মিহিন সুতোগুলো ছিঁড়ে যাচ্ছে
আমি শাওয়ারের নিচে ধুয়ে ফেলছি দীনতা
জিরাফের সুউচ্চ গ্রীবা
যেখানে লেগে আছে অহং
সঙ্কর সময়ের চিহ্নাবলি
সুস্পষ্ট ফুটে আছে এসে নগরায়ণের পরিধিরেখায়
পিস্তলের মত হিম নির্জন
শিশ্ন তাক করা আছে
কবে থেকে
উত্থানের বিষাদরহিত আমি
স্নানঘর থেকে বেরিয়ে এসেছি
দেয়ালে মেঝেতে কোথাও
চিহ্ন লুকাইনি কোনো

প্রখর সৌরালোকে শুকোতে দিয়েছি তোমারামার
লালজামা নীলজামা
আর সম্পর্কের মিহিন গ্রন্থিগুলি

গসপেল গসপেল ট্রুথ

গোপনে তোমায় খুব জড়িয়ে ধরল ঘূর্ণিহাওয়া। আর আঙুলের মন্ত্রণাও হয়ে উঠল কেমন একটু একটু গসপেল! আহা সেইসব ট্রুথ, বাগানে আর ফুল হয়ে ফুটল না। কোনো ট্রুথফুল আবহাওয়াবিদও আজ এল না ফোরকাস্টে। তাই টিভি চ্যানেল হায়, খুব হালকা গেল, হালকা গেল। হালকা হলেই নাকি হলকা – জেনেছিলে মদির শ্যানেল। তাই মিছেমিছি ঘূর্ণিহাওয়া জড়িয়ে ধরল তোমায়, ফলে আরও কিছু দুর দিকটাতে দ্রাক্ষালতা সরে গেল। আর *দ্রাক্ষাফল টক* – এই তথ্য জেনে পুনর্বার বয়েসী পাদ্রির দল ব্রিজ পেরিয়ে হন্তদন্ত চলে গেল, চলে গেল!

তুমি শিখেছ হর্টিকালচার

তুমি শিখেছ হর্টিকালচার
মাইলপ্রসারী সবুজের আকার
তুমি দেখেছ ঘাসের উদ্ভাবনী
কত না সহজে তোমার নিকটে আসে
তুমি ঘুরিয়েছ বায়ুকল
রৌদ্র দেখেছ ঘাসে
মুঠোয় ধরেছ ভ্রমর
পাখির টুইটকার অনায়াসে

তুমি কত না ছুঁয়েছ মেধার গোলাপ
চন্দ্রমল্লিকার ঝাড়
জেনেছ শৈলী রোদপ্রকরণ
শিখেছ প্রখর হর্টিকালচার

ঈদের দিন সকালের আলাপচারিতা

আমরা ভাবছিলাম বসে
চীনা শিশুখাদ্যের ভেতরে কতটা
থিতিয়ে আসছে মেলামিন,
কতটা মেরিলিন মনরোর ঠোঁট
ধীরে ধীরে হয়ে উঠছে যৌনাভ আর লালচে

আমাদের করাল ব্যবসায়ন
শিকারি বেড়ালের গোঁফ

আমরা ভাবছিলাম বসে
অল্প আগের ঈদের জমায়েত,
মানে নিদেন ছয়-সাত শ লোক ...
ঘন পরিসরের এসএমএস

আমরা ভাবছিলাম রিকশার চাকা, স্পোক
সম্ভাব্য বৃষ্টি, আর কিছু পরে বৃষ্টিসমেত
কি করে পৌঁছানো যাবে হাতিরপুল!

হিজল সংকেত

নগরে পড়ে আছে বৃষ্টির কাঠামো
হিজল সংকেত
আচরণ ভুলে থাকা বৃক্ষের বাকলে
রাখা আছে ঘন বিন্দুচ্চমকের স্মৃতি
ঘোড়দৌড়ের বন
থেকে উঠে আসা ছন্দকাতরতা
নুয়ে যাবে এসে
বিমর্ষ নগরের প্রান্তে

আমাদের সাম্প্রতিক স্মৃতি থেকে
মুছে যাবে সোঁদা কাঠগন্ধ
শহরতলি
অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মর্মর

পিয়ানোয় নখচিহ্ন

দীর্ঘ পিয়ানোর ক্রন্দন তুমি শোনো নাই! আরও দীর্ঘতর পড়ে থাকা পিপাসার জিভ আমার। আমি তো নীল ব্লেডে কাটি রক্ত, অনন্তবিষাদ, ভোর। রোদের ভেতরে গড়ানো বিষণ্ন মার্বেল, তার গায়ে লেগে আছে অবসাদ, গুচ্ছভ্রমর।

দীর্ঘ পিয়ানোর ক্রন্দন তুমি লিখে রাখো অনুপুঙ্খ রোদবিদ্ধ ডায়েরিতে, মেঝের দীর্ঘতর ছায়াটিও লেখো। লেখো হৃৎশব্দ, অপ্রচল মোহর। পিয়ানোৎপন্ন সুর এসে যখন খুব কোমল কেড়ে নেয় দৃষ্টি, শ্রুতি ও বাক

আঙুলের ডগায় তুমি লিখে রাখো এইসব; পিয়ানোর উদ্ভাস, খুচরো কলহাস্যের ঘোর।

বেবিসিটার মহিলার চোখ

আমি তার বাহুপাশে খুব মোলায়েম ঢলে পড়ব।
উদ্বাহু ব্যাকপেইনের ভেতর আমার শাণিত বৃশ্চিকগুলো
হেসে উঠবে যখন।

আমি ঐ বেবিসিটার মহিলার স্নেহার্দ্র চোখ থেকে অফুরান বর্ষাঋতু খুলে নেব। তার বাহুলগ্ন দৃশ্যাবলিতে গোপনে সংযুক্ত হব এসে।

স্পর্শাকাঙ্ক্ষী শিশুর মত অনু-খণ তার বাহুপাশে ঘুরে ঘুরে একদিন আমিও খুব ক্লান্ত ঘুমিয়ে যাব।

টোটেম সঙ্গীত

আমার ভেতরে জাগছেন পৌরাণিক বৃক্ষেরা
একে একে তাঁরা
ভেঙে ফেলছেন পিঁপড়ের পঙ্‌ক্তি
রন্ধ্রে রন্ধ্রে, বাকলে
তারা শুষে নিচ্ছেন প্রচ্ছন্ন হরিৎ
গ্রামদেশ

টোটেমের ভাঁজ খুলে সন্তর্পণে বেরিয়ে আসছেন
একত্রিশটা ছায়ার বেড়াল

জলের জ্যামিতি

স্থির জলে ভেসে আছে বিষণ্ন জ্যামিতি। দেখোনি চাঁদের স্ফুরণ
এসে খুলে নিয়ে যাচ্ছে লুপ্ত মাছের ঝাঁক থেকে অন্তর্গত
কিরিচের বিভা! তার উজ্জ্বল দেহত্বক থেকে খসে পড়া আশ্চর্য
হরফের রাশি।

অস্পষ্টে জেগে ওঠা বায়ু অঞ্চল, আমি পুষে রাখছি তোমার
জাগ্রত বর্শার ফলায় হরেক কৈবর্তরীতি। গড়ে ওঠা সমস্ত
ঢেউয়ের চূড়ায় শুনেছ কি উদগ্র কোনো এক শিকারির হাসি?
যিনি খুব তৎপর জল থেকে তুলে আনছেন – ছুরিকা, মৎস্যগন্ধ,
প্রেম আর বিশেষায়িত জীবিকারীতি।

সেইখানে ভেঙে পড়া জলের জ্যামিতি দেখো গড়ে উঠছে আবার;
প্রথাবিপরীতে। লুপ্ত মাছেদের দেহপাশে তখন চিহ্নিত আঁশ,
জলের শরীরে ফুটে ওঠা নিস্পন্দ নক্ষত্ররাজি।

বাঁকানো গ্রীবার নদী

এইসব অধমর্ণের বোধ
এড়াতে পারে না আমাদের
বাঁকানো গ্রীবার নদী
নিথর পাটকল
ফুঁড়ে উঠে আসে ব্যথালীন উদ্ভিদ
গঠিত ঘাসের দেয়াল
ধসে পড়ে
আহা ধুলোর সবুজ
আমাদের পুরনো অসুখের নাম হয়
বিলোপ ও বিস্মৃতি
আমাদের বাঁকানো গ্রীবার নদী বেয়ে অতিদুর
ষড়ঋতু ভেসে যায়!

চিহ্ন

ভিড় আমাদের ঘনিষ্ঠ করে।
মরে আসা রোদের ভেতরে
ম্লানিমা, ম্লানিমা।

বিষণ্ন বাড়ি ফেরা মানুষেরা
কি সহজ শিরোপার লোভ ভুলে গেছে!
মেরুন ছায়ার গহিনে
উজ্জ্বল তার দেহত্বক খুলে...

কোন এক নিরুত্তাপ ভিড় এসে
ডেকে নেয় কাকে? কার ম্লান মুখ
থেকে ভিন্নতর কোনো এক
বিষাদ তুলে আনে?

মিথগামী জুতো,
তুমি এখনও জানোনি –
পিষ্টঘাস শুধু সবার
বাড়ি ফেরার চিহ্ন ধরে রাখে!

সতেরোই নভেম্বর

সতেরোই নভেম্বর আমার মৃত্যুদিন হতে পারত! যেদিন আমার হাড়ের ভেতরে জেগে উঠেছিল সমস্ত পালতোলা নৌকো, প্রজাপতি, এশিয়ার বিষণ্ন আকাশ। আমার দেহকে বিদীর্ণ করে যেদিন খুব গাঢ় হয়ে নেমে এসেছিল অন্তস্থ শীত, কোলাহল-পরবর্তী এক ভীষণ নৈঃশব্দ্য। রেস্তোরাঁর চেয়ারগুলো কি ভীষণ নিঃস্ব দাঁড়িয়েছিল বিমর্ষ ওয়েটারের চোখের ভেতর! আহা বিরহকাতর শেফ; খুব নিভৃতে বসে ছিঁড়ে ফেলছিল তাদের উনুন-সম্পর্কের মসৃণ সুতোগুলো।

সতেরোই নভেম্বর সন্ধেটা খুব সুস্পষ্ট আমার মৃত্যুক্ষণ হতে পারত! যা এক আন্তরিক আঁধারের মত নুয়ে পড়েছিল এসে আমার বাহুপাশে। তার মুখাবয়বে আমি দেখতে পেয়েছিলাম – লুসিফারের জ্বলজ্বলে চোখ কতটা নির্লিপ্ত ও মেধাবী হতে পারে! তার মুখাবয়বে আমি একাগ্র দেখেছিলাম – সতেরোই নভেম্বর সন্ধেটা কী এক অন্তর্গত ত্রাস হয়ে ঢুকে পড়েছিল আমার হাড়ের সুড়ঙ্গে – মাইল মাইল, শাদা শাদা, স্পর্ধিত একদল তাতারের স্বভাবে।

এ ফর অ্যাপল

জ্ঞানবৃক্ষ থেকে দুরে, আপেলের লালগাড়ি অবিরাম গড়িয়ে যাচ্ছে এসে তোমার নিকটে। তুমি অনাদরে তাড়িয়ে দিচ্ছ তাকে দুরতম এক মেধাসরণির দিকে। ফলত আপেলের লালগাড়ি অভিমান নিয়ে চলে যাচ্ছে সমস্ত উদ্ভাবনী থেকে দুরে। উত্থানের প্রকৌশল আর জানা হচ্ছে না তোমার। সেইসব রয়ে যাচ্ছে নিবিষ্ট ম্যান্ডোলিনে, বুদ্ধিবৃত্তিক নিন্দুকের ঘরে। এই তো, মাত্র কয়েক শতাব্দ আগে, টুপ করে যেই আপেলটা এসে পড়েছিল ঘাসে; জ্ঞানবৃক্ষের তলে – তুমি তাকে ছুড়ে দিয়েছিলে কি এক বিচিত্র খেয়ালে, ধ্যানস্থ যুবকের দিকে। নিমিষেই যার নামে লেখা হয়েছিল ইতিহাস। আর তুমি হেসে উঠেছিলে হিস্টিরিয়া, অনৈতিহাসের ঘোরে।

যত পশ্চিমে যাই

যত পশ্চিমে যাই – হেসে ওঠে খুব বয়ঃসন্ধির বালক! এই
মনোগ্যামি সাইকেলখানা দুলে ওঠে, এক নিরর্থ পেন্ডুলামের মত।
বিষণ্ন জ্যামিতির বনে দুর্মর দাহকাল শুয়ে থাকে!
আমাদের ছায়াপ্রস্তুতির ভেতরে পাওয়া যেতে থাকে
চাপচাপ স্বর্ণরেণু ও ইশারা!
গোধূলির দিক থেকে একটানা কাকাতুয়া–চিৎকার ভেসে আসে।

উনচল্লিশ

এখনও শুরু হয় নাই কিছু
মেরুন বইয়ের পৃষ্ঠা
হলদেটে কবিতাক্রম;
মই বেয়ে নেমে আসা উনচল্লিশ ধাপ;
এই মোহন সাপলুডু।
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
বৃষ্টি থেমেছে আগে; অনেকক্ষণ ...
জানালাগুলি খোলা হয় নাই,
বেজমেন্টের গাড়ি
ধীরে উঠে আসছে রাস্তায়

উনচল্লিশ ঘর দুরে টায়ারের সব দাগ
বাঁকাচোরা শুয়ে আছে।

আমি তো ঘুণপোকা জানি না

ধাতুশব্দে ভেঙে যাবে কুয়াশার মিথ, রান্নাঘর।
অন্তরঙ্গা তৈজস ভেদ করে
গণিকার সাথে চকিত দৃষ্টিবিনিময় হবে।

দেখোনি টেরাকোটার ধস, সময়ের খুনসুটি!
আমি তো ঘুণপোকা জানি না
কবে আমার হৃৎপিণ্ড খেয়ে গেছে!

শুধু জানি ক্ষয়, এক আশ্চর্য ক্ষয় ...

দিগন্তপ্লাবী প্রপাতের গায়ে বয়ঃসন্ধি,
সেইখানে বিমর্ষ কিশোরের কোনো এক
স্বপ্নদোষ আঁকা আছে।

ভুল রুটের বাস

ভুল রুটের বাস, তুমি নিয়ে যাচ্ছ বিবিধ রোদের আকৃতি।
জানালার বিমর্ষ কপাটে ঝুলিয়ে রাখা নৃমুণ্ডুশিকারির লিপি।
আমাদের সান্ধ্যস্মৃতি সব, আর দুরের সিগনালবাতি। তুমি
মুলত নিয়ে যাচ্ছ বাতাসের গতিপথ। স্ফীত নিশানের গায়ে
রৌদ্ররাশি। আমাদের মেরুন সন্ধ্যাপাশে তুমি রেখে দিচ্ছ
স্ফটিকের বৈভব, বাতিলগ্ন ক্ষার, সমাগত গণিকার হাসি।
তোমার শরীরে লতিয়ে উঠছে ঐ দুরের দ্রাক্ষালতা। আহা
ভুল রুটের বাস, তোমার সাথে বদল হয়েছে প্রতিনিয়তের
ছক, টিকিট ঘর, ভালবাসাবাসি।

জলে

নৌবিদ্যা ভুলে আমি নিজস্ব কফিন
ভাসিয়ে দিচ্ছি স্থিরতম জলে,
দৃষ্টির ঔদাস্য থেকে প্রণয়ের গান মুছে দিয়ে,
তবুও তো মাস্তুল জাগে
এমন ছিন্ন রাতে!

আমার শবদেহ পৃথিবীর নদীগুলোয়
ভেসে ভেসে
একদিন ঠিক বেহুলাকে চিনে নেবে
মিথভাঙা আন্তরিক আঁধারে।

টানসুত্র

জল এখানে বুদ্ধের চোখের মত শান্ত; স্থিত। সেই সুত্রে কিছু
কম্পনের কথা ভাবা যাক অথবা ছিন্ন জ্যামিতি। গৃহী মানুষেরা
দ্রুত নির্বাণের লোভ ভুলে বৃক্ষের বাকল থেকে তাদের জীবনাচরণ
খুলে রাখেন; যেভাবে একজন নিদ্রিত মাঝি – অনেক পারাপারের
সন্তাপ নিয়ে ঘোর থেকে জাগেন; জেগে ওঠেন পুনর্বার সময়ের
দেহ-ত্বকে। তার নির্জন কাঁধ থেকে গৃহী মানুষের অনেক ভ্রমণের
টানসুত্র আসে, আসে পরিব্রাজকের জুতো – ক্লান্তিখচিত অপরাহ্ণ,
বিপন্ন অনেক পর্যটন-গাঁথা।

পরিহাসপরায়ণ তরুণীর ভ্রু ভাষা গৃহী মানুষেরাও একদিন
পড়তে শিখে যাবে, শিখে যাবে বুদ্ধের সমাহিত চোখ থেকে নির্জন
কোনো পারাপার বিদ্যা, বৈঠাপ্রসূত সম্ভাব্য ঢেউ আর সহজ
নির্বাণের প্রকরণ যত এযাবৎকালে হয়েছে চিহ্নিত।

প্রত্নমার্বেল

তার দিকে গড়িয়ে দেয়া যায়
গল্পের বল
দ্বিধাশব্দ
একুশটা বিষণ্ন মার্বেল

আস্তিনের রোরুদ্য গোলাপ
তার দিকে গড়িয়ে দেয়া যায়
এই বিমর্ষ গোধূলি
চন্দ্রাতপ
উদ্ভাবনের সকল বেলুন

গড়িয়ে দেয়া যায় কেমন
ইশ্‌কাপনের দান
মুদ্রাসঙ্কেত
সৌরপতনের সূত্রাবলি
যারা প্রত্নমূল্য জানেনি
আর দ্রুত ভুলে গেছে খননের দাগ
আহা ব্যাসকূট
যেভাবে হয়ে ওঠে প্রাঞ্জল
এক চিহ্নফসিল

সমুদ্র সংকেত

তারপর একদিন শামুক গুটিয়ে গেল
চুলের ফিতের মত পথটুকু কিছুতেই
শেষ হল না আর –
ফলে তোমাকে দেখানো হল না সমুদ্র,
বালিয়াড়ি, দিকচিহ্নের প্রপঞ্চ।
তোমাকে দেখানো হল না আর
নবম মেঘের ওপর কতটা
ঢলায়মান রাত্রি! এই লুম্পেন কুয়াশা
চিরে ফিরে যাওয়া আসলে কতটা অসম্ভব।

গৈরিক দিনাবলি

এই যে বসে আছি অভীপ্সাহীন, বৃশ্চিকরেখার মাঝে।
দেখছি নিদাঘের দিন, আমাদের প্রণয়কাতর তুলোবীজেরা
উড়ে যায় কেমন মুখরা রমণীদের কাছে! এমন গৈরিক দিনে
নিরুদ্দেশ কোন হাওয়া এলে ধীরে – সন্তর্পণে তুলোবীজ
জাগে, বিষণ্ণতার দিকে খানিক বেঁকে যায় রেলসড়ক।

এই সুনসান রাস্তাটি গিয়ে শেষ হল যেখানে, তার পাশে
নিশ্চুপ এক জলাধার আছে। সেখানে অনিঃশেষ কৃষ্ণচূড়ার
দিন এলে হেসে ওঠে সমস্ত বনভূম। অভীপ্সা জেগে ওঠে
ক্রমে। সমস্ত দাহকাল মুখরা রমণীদের ভ্রু-পল্লবের ডাক
হোক, ধীরে!

ক্রিমসন

শীতল পানপাত্রের গায়ে
দেখা গেছে কার আবছা লিপস্টিক,
সন্ধের আগে যেইসব
হয়ে ওঠে এমন ক্রিমসন, যৌনতা।
শুনেছ কি হাড়ের ভেতর
বেজে উঠেছিল সুমন্দ্র লিরিক
এবং ঘুণপোকা,
ঘুণপোকা মূলত
কাঠের ওইপাশে
দেখা গেছে বিধ্বস্ত শিরীষ
আর আচ্ছন্নতা।

এমন গ্রীষ্মের মোহে জেগেছিল
যে সকল জারুল সম্ভাবনা,
সেইখানে বসে আছি, অস্তাচল।
যেমন কৌণিক থেকে তাদের
ছোঁয়া যায় খুব,
কী সহজ টেবিলক্লথের ফুল,
দুলে ওঠা ঘড়ি –
যার থেকে টুপটাপ ঝরেছিল সমস্ত
সময়ের একক, পিপাসা।

দুরের কাজলবন সন্তর্পণে
উঠে এল যার চোখে, পানপাত্রে
ক্রিমসনরঙা মূলত
তারই ঠোঁটজোড়া।

নক্ষত্রপাঠ

যিনি আমায় নক্ষত্র চেনালেন,
আমি তার নাম ভুলে গেলে
আমাদের চারপাশে এক
অপ্রস্তুত রাত নামে,
দেয়ালের পাশে পড়ে থাকে সব
বিদীর্ণ প্রজাপতি।

আমি তো চিনেছি সব বর্ধনশীল ফাটলের দাগ,
নিমগ্ন অর্কিড প্রজাতি।
আমি চিনতে শিখেছি মানবিক স্পর্শের ট্যাবু,
বাতাসের সুর,
নক্ষত্রপাঠের ব্রেইল পদ্ধতি।

ঘুম ভেঙে গেলে

ঘুম ভেঙে গেলে আমি রাতবেলা টেলিভিশন চালাই। নিদ্রিত নারীটির পাশ থেকে উঠে গিয়ে মগ্ন ফ্রিজের ধ্যান ভাঙি, লঘুপায়ে হাঁটি। ফলত ছিমছাম একটি সোফা-পরিবারের সাথে পরিচিত হবার চমৎকার সুযোগ মিলে যায়। তার পাশে গড়ে ওঠা বিষাদমনস্ক শোপিস কলোনি; খুব আলগোছে ভেঙে গেলে দেখি একেকটা দূরত্বের অজগর বিড় পাকিয়ে শুয়ে আছে কেমন অনাত্মীয় আঁধারে! যেখানে শূন্যতা, লোমশ কারপেট, জোছনারহিত আমার ঘুমের ব্যালকনি। কলঘরে পানি পড়ে। কাউকে জাগাই না, শুধু অনিদ্রার তলপেটে ধাতব কলটির কিছু শৈথিল্য লিখে রাখি।

অনেক ঘাসের মাঠ

অনেক ঘাসের মাঠ, চিহ্নিত রোদের আড়ালে ঠিক এইভাবে ডুবে আছে। যুদ্ধফেরত কোনো সৈনিকের বোধ নিয়ে, আমাদের নীরব মনস্তাপের ভেতর তুমি শোনো, ব্যথালীন সুর কি নিভৃতে বেজে ওঠে! তোমার মুঠোর ভেতর একাগ্র বিষাদ আমি খুঁজি, আশ্চর্য ঘাস ওই, সমস্ত সবুজ যেন ক্রমেই মরে আসে! অনেক ঘাসের মাঠ রোদমগ্ন। তুমি শোনো, অপ্রেম জেগে আছে এইখানে, সবুজ হেলমেটের আড়ালে।

আগ্নেয়

ছায়াচ্ছন্ন হয়ে আছি; মৌনরাত,
সিলিঙে ঝাড়বাতিরা যেভাবে।
ছোবল লুকিয়ে তোমার নাভির ওপর একটা
মৃত সাপ এঁকে ফেলি –
বাহুমূলে উন্নাসিক আর কোনো উলকি চেয়ো না।

কোথাকার ঢেউ ভেঙে ভেঙে
নদীরা গড়ে ওঠে!
বুকে জমে ওঠে হৃৎতড়িৎ

তারল্যভেদ জানেনি –
উলকির ব্যবধানে ঘুমিয়ে পড়েছে কেমন
জ্বরতপ্ত পিস্তল আমার!

হাওয়াবন্দুকের ঘোড়া

লাফিয়ে উঠছে আমাদের হাওয়াবন্দুকের ঘোড়া। এই নির্মম পাখিশিকারের দিনে দুরে কোথাও বেজে উঠছে ক্রমে সকরুণ বেহালা। নির্মোহ কার্তুজসঙ্গীত এক ... আমাদের নিঠুরতম সময়ের সন্নিকটে রচিত হচ্ছে মেরুবৈকল্য, ঋতুগত নৃশংসতা।

ত্রস্ত পালকগুচ্ছ, তুমি এই ঋতু শূন্য ফিরে যাও। আর জেনে নাও, এমন কুয়াশার কালে আমাদের আচরণে মিশে থাকে পাখিশিকারির নির্লিপ্তি, হিমাঙ্কের ডিলেমা।

স্থলবিদ্যা

বোতাম চাপতেই খুলে গেল জলের অন্দর। আমার দ্বিধার গোল্ডফিশ অ্যাকোয়ারিয়ম থেকে ডানা ঝাপটে উড়ে গেল দুরে; অন্তত ছয় নটিক্যাল মাইল। আমার বিনম্র মসের বাগানখানি ভেস্তে গেল। ফলে পাখিদের সাঁতার বিষয়ে আর কোনো কথা হল না তার সাথে। বোতাম চাপতেই সব পাখি একসাথে জলে ডুব দিল। অবশিষ্ট কথাটি এইখানে মূলত ফুলচাষিদের হাসি। পাগলাগারদের মানচিত্র। আহা, এই বেলা আমি খুব আপেল ভালবাসি। ভালবাসি সীমিত আকাশ। উড়ুক্কু মাছ আর সাঁতারু পাখিদের কাছ থেকে শিখে নেই সঞ্চালন, রুদ্ধশ্বাস চুম্বন-প্রণালি।

এখানে সিঁড়ির ঢাল

এখানে সিঁড়ির ঢাল প্রখর অনেক
এবং ছায়ার ব্যাপ্তি

মৈথুন হাতে ফিরে গেছে যারা
দলে দলে
অথৈ তৃণভূম ছেড়ে
তাদের দেহরং সমুদ্রাভ

ছায়া থিতিয়ে এলে
তারা খুঁজে নিয়েছিল
নভোনীল নারীদের আঁশ ও অস্থি

মোহের অফুরান সিঁড়ি বেয়ে
তারা কি সহজ উঠে এসেছিল
অনুচ্চতায়

লিবিডো জেগে উঠেছিল দুরে
পিউবিস থেকে আরও দক্ষিণ
সমুদ্রবতী

দেয়ালিক

নৈঃশব্দ্য ভাঙার টুলস হিসেবে বহু দিন ব্যবহৃত হয়েছে হাওয়ার শব্দ, করতালি, বনমর্মর। প্রান্তর থেকে আসা মানুষের হ্রেষা পৌঁছেঁছে দেয়ালের কানে কানে। জ্ঞানত দেয়াল স্বস্তিপ্রদ বধির। শ্রুতি খোলে মৌল-নৈঃশব্দ্যে। হাড়ের কফিন পাশে রেখে আসি মৃতের নীরবতা, আর ডালা ভেঙে ওড়াই লক্ষ পাখির ঝাঁক। যাদের কূজন সুনসান গাঁথা আছে দেয়ালের কানে কানে। নাদব্রহ্ম, মেঘের হারমোনি – কেউ জানল না তারা, শিস ও শিৎকারে টলে ওঠে কতটা পৃথিবীর বধির দেয়াল! এই সান্ধ্যনদী পেরিয়ে চলে গেল যারা; তারা জেনেছিল শুধু, বধিরতার কোনো মিথ কলতানে ধরা নেই। সেইসব রাখা আছে দেয়ালের কানে কানে, গূঢ়তরঙ্গে, নৈঃশব্দ্যবিধুর।

সিঁড়িঘরে

ওইখানে টেলিফোন বাজে ভিনসুরে
কেউ তোলে না
তোলে না

ছাদের তারে উদাসীন কাপড় কিছু
শুকোয় আদরে
ভাঁজের ভেতরে তার আবছায়ে
সুনম্র অন্তর্বাস চোখে আসে

এমন দৃশ্যে বিষণ্ন টেলিফোন কাঁদে
কেঁদে ওঠে
আমাদের মিথগামী জুতোগুলো
অযত্নে পড়ে থাকে সিঁড়িঘরে
পারম্পর্য ভাবা যায়
এইভাবে
ঈষৎ কামনার সিঁড়িঘরে

বাতাসে যখন খুব
লুকোনো অন্তর্বাসের রটে যাওয়া
ঘ্রাণ ভাসে

কর্পুর–সন্ধ্যার বয়ান

অদ্ভুত রাজহাঁস হাঁটে সমাহিত পুকুরের ঢালে। মনোবেদনা লুকিয়ে তার সাথে খানিক সংশ্লেষ হতে পারে। বিমোহিত পতনসমগ্র ঝরে পড়ে যখন তার গ্রীবার অহং থেকে, প্রস্থান–প্রবণতার বহু পাঠ নিয়ে ধীরে, অতি ধীরে নিণীত হতে থাকে বিপন্ন ঘাটের বাকল। সেইখানে জেগে ওঠা বাদামি নখের কিনার ঘষে ঘষে স্নানরতা কোনো কারও ব্রীড়া থেকে গড়ে ওঠে একেকটা মৌলিক ঢেউয়ের নির্মিতি। সে কি লেখে, সে কি লিখে রাখে এইসব প্রাঞ্জল জলস্রোতের তড়িৎ! স্খলনের নীল আমি তুলে দেব কার ঠোঁটে? নির্মোহ দুপুরের ঘ্রাণে ভেসে যেতে যেতে এইসব রাজহাঁস ক্রমেই বিনয়ী হয়ে ওঠে – নিস্তরঙ্গ জলের কিনারে, উদ্বায়ী সন্ধ্যার কিছু আগে।

ধারণাহীন সঙ্গীতের মত

উদ্ধত দালানের অহং এইখানে নুয়ে যাবে। এলভিসের জুলপি থেকে গড়িয়ে নামবে ঘাম। সিঁড়িঘরের নির্জনতা চিরে ফেলা প্রতিটি পাখির নামই একদিন হবে ইকো। শাদা পৃষ্ঠা থেকে মুছে ফেলা হবে সমস্ত মায়াবী অক্ষর। আর আমাকেও গাওয়া হবে ধারণাহীন সঙ্গীতের মত এক অশ্রুতপূর্ব সুরে।

পুর্বের নথি মোতাবেক

পাড়া না জুড়োলেও ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে বর্গির ছায়াপাশে, ক্ষুৎপিপাসাবশত। আমরা অভিজ্ঞতায় জেনেছি – শস্যের প্রাচুর্যই শুধু বুলবুলিদের ডেকে আনে। অগাধ শর্করার গান প্রতিঋতু সমস্ত শূন্যতার ভেতর কি দারুণ উঠে আসে! আর আমাদের পুনঃপৌনিক ধারণা হয় – কোথাও কোনো ভরাট গোলা নেই এই গ্রহে। আমাদের নিরন্ন ছেলেরা ঘুমিয়ে পড়েছে এইহেতু নির্বান্ধব উঠোনজুড়ে, অনেক বুলবুলির ফ্যান্টাসি চোখে মেখে, অনেক মায়া-অঞ্জন...। যার জ্ঞানে পৃথিবীর সমস্ত হেমন্ত দিন ফুরিয়েছে সেই কবে! প্রেতচাঁদ তুমি শোনো – যদিও অর্ধাঙ্গ, তবু জেনে নাও; রসুন বুনে খাজনা অপরিশোধ্য মূলত। পুর্বের নথি মোতাবেক, সবুরের কোনো মেওয়া ফলেনি এ তল্লাটে।

পাথরবাগান

এই পথে চলে যায় মন্থর মৃত্যুর ক্যারাভান। বৃশ্চিকসূর্যের নিচে
আমাদের পাথরবাগানখানি নিরন্তর পোড়ে। হায় ধূলিসংহিতা,
আমি তো রৌদ্রমাতাল গাছেদের যিশু। ক্রুশকাঠে ফেলে এসেছি
বৃক্ষধর্ম, কণ্টকমুকুট আমার! আমি উঠে এসেছি অলিভরঙা
যুবতীর তলপেট ভেদ করে, ডিঙিয়ে চুম্বকপাহাড়। এই কথা
দুর্বিনীতেরা জানেনি। ফলে আজও একটা সবুজ গাছের নাম
হতে পারে জুডাস। পাথরবাগানে উদগত কিছু ক্ষমাহীন ক্যাকটাস।

নীলকুহকের বাড়ি

ঘনবিদ্যুৎ! এই পলকা ট্রিগার, কিছুদুর গেলে মিলবে সুনিশ্চিত
নীলকুহকের বাড়ি। দেখো মেঘের ফুলকি, অনেক বজ্রমাতাল গ্রাম
পেরিয়ে এসেছি আমি এই বনভূম। বাসুকির ছায়া পড়ে আছে দুর
সমুদ্রবিস্তারে। সহস্র বাতিঘর জ্বলেছে এইখানে, এই অনন্ত টানেল
আর নীল রঙ! সময়ের দাগ লেখা আছে সব রেডিওকার্বনে। আজ
এই রাতে অবগুণ্ঠনের ছল, আজ বিচূর্ণরেখা! কুহকের বাড়ি হাওয়ায়
মিলিয়ে যায় ভ্রমে-বিভ্রমে।

রচনাকাল
২০০৮-২০১০

ই-মেইল: mail.andaleeb@gmail.com